গোরা উপন্যাস ঃ একটি অনুসন্ধান

রাহুল চট্টোপাধ্যায়

জীবনকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন এক সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। জীবনকে তিনি স্পর্শ করেছেন সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ নিজের অস্তিত্বের মধ্যে প্রাণ ও প্রকৃতির এই আদি ও অকৃত্রিম সম্পর্ককে উপলব্ধি করেছেন। প্রকৃতি তাঁর কাছে প্রাণময় এক সত্তা। এই সত্তাই সমগ্র জগৎ জুড়ে সৃষ্টি করে চলেছে। 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

'আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ...
তাই আজি
কোনো দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি —
তোমার মৃত্তিকামাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর...'[১]

সারা পৃথিবীর প্রথম প্রাণ সঞ্চারে ওই নবীনা পৃথিবীমাতাকে জড়িয়ে ধরে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেদিনের সেই আন্দোলন, সেই 'অন্ধপুলক', সেই শিকড় দিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরে 'স্তন্যরস' পানের অনুভূতি, যুগযুগান্তর পার হয়েও কবিসত্তাকে আলোড়িত করে। 'নবনব যুগে' পৃথিবীর মাটিতে জন্মেও সে অনুভূতির স্পর্শ কবিকে ভাবায়। সেদিনের প্রাণস্পন্দন কবির শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়েছে - শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে ওই প্রাণস্পন্দন নিখিল বিশ্বের সবকিছুতে মিশে গিয়েছে। তিনি লিখেছেন ঃ

'পৃথিবীর মাটি জল বাতাস উত্তাপ, পৃথিবীর ওজন আয়তন গতি, সমস্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যে এই শরীর; কোথাও তার সঙ্গে এর একান্ত ছেদ নেই। বলা যেতে পারে, পৃথিবী মানুষের পরম দেহ; সাধনার দ্বারা যোগবিস্তারের দ্বারা এই বিরাটকে মানুষ আপন করে তুলছে,... দুই হাত পাচ্ছে বহুসহস্র হাতের শক্তি, দেশের দূরত্ব সংকীর্ণ হয়ে আমাদের দেহের নিকটবর্তী হচ্ছে।'[২]

এই পৃথিবী তথা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপন দেহের সীমার মাঝখানে উপলব্ধির কথা একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার কথা। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব বিশেষ অভিব্যক্তি লাভ করেছে ঃ

'আমি সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র এবং মাটি পাথর জল সমস্তের সঙ্গে একসঙ্গে আছি এই কথাটা এক — এক শুভ মুহূর্তে যখন আমার মনের মধ্যে স্পষ্ট সুরে বাজে তখন একটা বিপুল অস্তিত্বের নিবিড় হর্ষে আমার দেহমন পুলকিত হইয়া ওঠে।... আমার সত্তায় জড় ও জীবের সমস্ত সত্তা সম্পূর্ণ হইয়াছে।...'[৩]

পদ্মাতীরে জমিদারির কাজ দেখাশোনার সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও মানুষের যে নিবিড় সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তার মধ্যেই সম্প্রসারিত হয়েছিল তাঁর সত্তা। তিনি বিস্ময়কর দৃষ্টিতে লক্ষ করেছিলেন প্রকৃতির বিচিত্র লীলার মাঝে মানুষের সহজ জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা। 'ছিন্নপত্রে' তিনি লিখেছেন ঃ

'.... পৃথিবীতে একটা বৃহৎ কর্মপ্রবাহ চলছে যার অধিকাংশের সঙ্গেই আমার যোগ নেই — পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আমার কেউ নয়, অথচ তাদের কত কাজকর্ম সুখদুঃখ উৎসব-আনন্দ চলছে। কী বৃহৎ পৃথিবী! কী বিপুল মানবসংসার! কত সুদূর থেকে জীবনের ধ্বনি প্রবাহিত হয়ে আসে...'[৪]

কবি এই জীবনের ধ্বনি খুঁজে পেয়েছেন একেবারে সাধারণ জনতার মধ্যেই। রাখালের করুণ সুরে, উলঙ্গ ছেলেমেয়েদের খেলার কল্লোলে, দাঁড়ের ঝুপঝাপ ধ্বনিতে, কলুর ঘানির তীক্ষ্ণকাতর নিখাদ স্বরে, পাখির ডাকে, পাতার শব্দে বহমান জীবন আপনার স্পর্শ রেখে চলেছে। এই ক্ষুদ্র পরিসরের জীবন থেকেই মহান মানুষকে খুঁজে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। চরম কষ্টসাধ্য সে পথেই পরমকে লাভ করা সম্ভব বলে মনে করেন কবি, তাই লিখছেন ঃ

'তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তরপ্রদীপখানি।'[৫]

এই চিরন্তন অভিযাত্রী মানুষের কথাই বারবার বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। কবির জীবনে 'জীবনদেবতা' হয়তো এই

অভিযানের নিরুদ্দেশের পথে তাঁকে অনুপ্রাণিত করছেন। তিনি অনুভব করেন, তাঁর সকল 'আমিত্ব' ভেঙে যাচ্ছে, জেগে উঠছে নতুনতর বোধ। এই উপলব্ধির পর্বে পর্বে বৃহৎ মিলনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। কবিসত্তার সঙ্গে মিলিত হয়ে অন্য কেউ যেন অনন্তকাল ধরে এগিয়ে আসছেন, কবির ভাবনার জগতটিকে আশ্রয় করে সৃষ্টির নবনব অভিব্যক্তি ঘটাতে চাইছেন, সীমা এবং অসীমের, অন্ত আর অনন্তের এই চিরন্তন লীলাটি জীবনদেবতা ভাবনার মূল সুর।

কবি এই ভাবনার আশ্রয়েই ভেঙে চলেছেন সকল খণ্ডতাকে সকল অপরিপূর্ণতাকে। জীবনে যা কিছু সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র, অশুদ্ধ তাকে ভেঙে নতুন শুদ্ধতর চেতনার উদ্বোধনেই সার্থক হয়েছে জীবনদেবতার উপস্থিতি, কোন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি নয়, বরং একান্ত বাস্তব জীবনের ক্ষুদ্র জগতখানির মাঝে নিজের চেতনার সংঘর্ষের কথা জীবনদেবতার প্রসঙ্গটিকে চিরকালীন করে তুলেছে। এই সকল বিপরীতমুখী নানা অনুভূতির সংগমে কবি রবীন্দ্রনাথ প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছেন, নিজেকে চিনছেন, অভিজ্ঞ হচ্ছেন ঃ

জীবনদেবতার এই ভাবখানি সমালোচক শ্রী অজিত কুমার চক্রবর্তী সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

'জীবনদেবতা কেবল যে এই জীবনের 'আমি'র সমস্ত সুখ, দুঃখ সৌন্দর্যবোধ ও প্রেমকে বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতার দিকে এক করিয়া তুলিতেছেন তাহা নহে, তিনিই বিশ্ব-অভিব্যক্তির নানা অবস্থার ভিতর দিয়া প্রবাহিত এই 'আমি'রই একটি অখণ্ড সূত্রকে অনাদিকাল হইতে ধারণ করিয়া আছেন।'[৬]

এই অখণ্ডসূত্র সকল ভেদ-বিভেদ দূর করে মানবাত্মাকে অসীমের প্রতি ধাবমান করে তুলছে এবং এক অতি গভীর বিশ্ববোধে পূর্ণ করে তুলছে। 'মানুষের ধর্ম' নামক বক্তৃতার মধ্যে এই কথাটিকেই পরিস্ফুট করলেন তিনি, বললেন ঃ

' মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর-একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে, জীব চলেছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন্ দিকে নির্দেশ। যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যে দিকে বিশ্বমানব।'

এই আদর্শের কথাই রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের মূল কথা।

॥ দুই ॥

'গোরা' উপন্যাস লেখা হয় ১৯০৭-১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে। উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসাবে আগের শতাব্দীর বিশেষ সময়কাল ব্যবহৃত হয়েছে। আর উল্লেখযোগ্য বিষয় হল গোরার জন্মসময়টি — ১৮৫৭ সাল। সময় নির্বাচনে লেখকের গভীর উদ্দেশ্যমূলকতা খুঁজে নেওয়া যায়। গোরার জন্মসময় সিপাহী বিদ্রোহের বছর। এই সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে ইতিহাস বিশেষজ্ঞদের অনেকেই প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের ইঙ্গিত পান। আবার অনেকে এভাবে না দেখেও এটাকে ওই সময়কালের একটি বিশেষ ঘটনা হিসাবে মানেন। রবীন্দ্রনাথ গোরা উপন্যাসের ৭৫তম পরিচ্ছেদে গোরার জন্মরহস্য উদঘাটন করেছেন। আনন্দময়ীকে মাঝখানে রেখে কৃষ্ণদয়ালের মুখ দিয়ে দীর্ঘদিনের গুপ্ত কথা প্রকাশ পেয়েছে। গোরা জেনেছে তার জন্ম ইতিহাস। কৃষ্ণদয়ালের মৃত্যুর পর তার শ্রাদ্ধ করার অধিকার গোরার নেই - এমনই ভয়ঙ্কর কথা তাকে শোনাতে গিয়ে কৃষ্ণদয়াল সত্য উন্মোচনে তৎপর হয়েছেন ঃ

'গোরা চকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, 'আমি ওঁর পুত্র নই?'

আনন্দময়ী কহিলেন, 'না।'

অগ্নিগিরির অগ্নি-উচ্ছ্বাসের মতো তখন গোরার মুখ দিয়া বাহির হইল, 'মা তুমি আমার মা নও?'

আনন্দময়ীর বুক ফাটিয়া গেল; তিনি অশ্রুহীন রোদনের কণ্ঠে কহিলেন, 'বাবা, গোরা তুই যে আমার পুত্রহীনার পুত্র, তুই যে গর্ভের ছেলের চেয়ে অনেক বেশি বাবা!'

গোরা তখন কৃষ্ণদয়ালের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'আমাকে তবে তোমরা কোথায় পেলে?'

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, 'তখন মিউটিনি। আমরা এটোয়াতে। তোমার মা সিপাহীদের ভয়ে পালিয়ে এসে রাত্রে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তোমার বাপ তার আগের দিনেই লড়াইয়ে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল —'

গোরা গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, 'দরকার নেই তাঁর নাম। আমি নাম জানতে চাইনে।'

কৃষ্ণদয়াল গোরার এই উত্তেজনায় বিস্মিত হইয়া থামিয়া গেলেন। তারপর বলিলেন, 'তিনি আইরিশম্যান ছিলেন। সেই রাত্রেই তোমার মা তোমাকে প্রসব করে মারা গেলেন। তারপর থেকেই তুমি আমাদের ঘরে মানুষ হয়েছ।'[৮]

এই উন্মোচিত সত্যের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ যেন সমকালকে ধরতে চাইলেন। গোরার জন্মের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপ-সন্ধানের প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথকে ব্রতী হতে দেখলাম আমরা। ব্যক্তিজীবনের ধারা এবং দেশের চিরন্তন সভ্যতার ধারার সংযোগসাধনের মাধ্যমে মূল সত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে উপনীত হওয়ার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। ব্যক্তির অস্তিত্ব চেতনার প্রশ্নটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তেমনি ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের সূত্রানুসন্ধানও লেখকের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। তাই একদিকে 'মিউটিনি', অন্যদিকে সমকালীন বঙ্গ দেশের নানা ধর্মীয় বিশ্বাসের ধারার

সংঘাতের কথা উপন্যাসটিতে আমরা পাই। নানা সামাজিক প্রশ্ন উঠেছে এসেছে নানা চরিত্রকে ঘিরে। তবে রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসে আত্মানুসন্ধানের প্রশ্নটিই গুরুত্ব পেয়েছে সবচেয়ে বেশি - তিনি গোরা চরিত্রকে ঘিরে সন্ধান করেছেন শিকড়ের। ভারতবর্ষের মাটির স্পর্শ, লোকজীবনের ঘ্রাণ, দেশজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য — সবকিছুই গোরার অস্তিত্ব চেতনা এবং ভাব সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে আস্বাদিত হয়েছে। উপন্যাসের মধ্যে এটিই আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং উজ্জ্বল বলে মনে হয়।

গোরার জন্ম পরিচয় উন্মোচিত হবার পর এক মুহূর্তেই চেনাজানা তার পৃথিবীটা পরিবর্তিত হয়ে গেল। প্রবল হিন্দুত্ব, শুদ্ধ আচার সর্বস্বতার বাইরে এক ভিন্নধারায় এসে পড়ল সে।

'সে যে কী, সে যে কোথায় আছে, তাহা যেন বুঝিতেই পারিল না। তাহার লক্ষ পশ্চাতে অতীতকাল বলিয়া যেন কোন পদার্থই নাই এবং তাহার সম্মুখে তাহার এতকালের এমন একাগ্রবর্তী সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেছে।... তাহার মা নাই, বাপ নাই, দেশ নাই, জাতি নাই, নাম নাই, গোত্র নাই, দেবতা নাই। তাহার সমস্তই একটা কেবল 'না'।'

ওই বিশেষ কয়েকটি শব্দের মধ্যে সমগ্র উপন্যাসের অনুসন্ধানের স্বরূপটি পরিস্ফুট হয়েছে। নামগোত্রহীন কর্ণের মতোই আজীবন অস্তিত্বের এক সংকটময় মুহূর্তে জাগ্রত শিকড়-চেতনা গোরাকেও টান দিল মাটির দিকে। গোরার চেতনায় এই মাটির টান একেবারেই দেশের মাটি, যা আনন্দময়ীর রূপ নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, সে বলছে ঃ

'মা, তুমিই আমার মা! যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই - শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা! তুমিই আমার ভারতবর্ষ! — 'মা, এইবার তোমার লছমিয়াকে ডাকো। তাকে বলো আমাকে জল এনে দিতে।'[১০]

জাতধর্ম গোত্রের বাইরে গোরা যে ভূমিতে এসে দাঁড়ায়, সব প্রেম সেই ভূমিতে এসে মিলে যায় - ভিন্ন ভারতবর্ষের অধিবাসী থেকে মূল স্রোতে মিশে যায়। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের মূল স্রোতের অভিমুখটিকেই সামনে নিয়ে আসেন - বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের ভাবনায় অস্পৃশ্যতার অভিশাপের বিরুদ্ধে মানবতার কথাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। হিন্দুত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, শাস্ত্রীয় তর্ক-বিতর্কের একটা ধারাকে রবীন্দ্রনাথ খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন। শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উৎসাহ যেমন ধর্মীয় ধারাগুলির মধ্যে ছিল, তেমন কিছু কিছু উদার দৃষ্টিকোণও ধরা পড়েছিল। সে সকল কথা গোরা উপন্যাসে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে লিখেছেন তিনি। তবে ভারতবর্ষের জীবনের যে চিরন্তন সাধনা তার দিকেই মনোযোগ দিয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে দুটি ভিন্নধারার ছবি স্পষ্ট করে তুলেছেন। চর-ঘোষপুরের গোরার অভিজ্ঞতা এই ছবিকেই প্রমাণ করে। গোরা ভ্রমণে বেরিয়ে গ্রাম্য ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ এক অপরিচিত ছবি দেখেছে। ওই গ্রাম্য ভারত আত্মবিচ্ছিন্নতার অভিশাপে অভিশপ্ত। গোরা দেখেছে বিচ্ছিন্ন, সংকীর্ণ, দুর্বল, নিজের শক্তি সম্বন্ধে নিতান্ত অচেতন, মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন এক দেশ। গোটা ভারতবর্ষের জীবনধারার বাইরের এক দেশ রয়ে গিয়েছে তার বহু প্রাচীন এক কাঠামোর মধ্যেই। বাইরের আর অন্তরের বিরোধের এই করুণ আখ্যান রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি ঃ

'প্রত্যেক পাঁচ-সাত ক্রোশের ব্যবধানে তাহার সামাজিক পার্থক্য যে কিরূপ একান্ত, পৃথিবীর বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে চলিবার পক্ষে সে যে কতই স্বরচিত ও কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত, তুচ্ছতাকে যে সে কতই বড়ো করিয়া জানে এবং সংস্কার মাত্রেই যে তাহার কাছে কিরূপ নিশ্চলভাবে কঠিন - তাহার মন যে কতই সুপ্ত, প্রাণ যে কতই স্বল্প, চেষ্টা যে কতই ক্ষীণ - তাহা গোরা গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন করিয়া বাস না করিলে কোনমতেই কল্পনা করিতে পারিত না।'[১১]

গ্রামের এই চেহারার পাশাপাশি আরও একটি দিক গোরার চোখে পড়েছে। নীলকর সাহেবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ফরু সর্দারের অসহায় অবস্থায় তার ছেলে তমিজকে এক নাপিত পরিবার আশ্রয় দিয়েছে, প্রাথমিকভাবে এই ঘটনায় গোরা কিছুটা ক্ষুব্ধ হলেও পরবর্তীকালে সমস্ত ঘটনা শুনে এবং ইংরেজদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে-চলা মাধব চাটুজ্যের কার্যকলাপে বিরক্ত হয়ে সে তার মনোভাব বদল করে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অভিভূত গোরার মাধব চাটুজ্যের আতিথ্য গ্রহণ করার কথা ভাবতেই অসহ্য বোধ হল এবং মনে বিদ্রোহের ভাব জাগ্রত হল। লেখকের কথায় ঃ

'সে ভাবিল, পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিস করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে আমরা এ কী ভয়ংকর অধর্ম করিতেছি! উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে লোক পীড়ন করিতেছে তাহারই ঘরে আমার জাত থাকিবে, আর উৎপাত স্বীকার করিয়া মুসলমানের ছেলেকে যে রক্ষা করিতেছে এবং সমাজের নিন্দাও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই ঘরে আমার জাত নষ্ট হইবে!'[১২]

জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতার আবহাওয়া ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনের একটা অন্ধকার দিক, গোরা তা উপলব্ধি করেছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর সমকালের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে নিপুণ বিশ্লেষণ করে এই ভেদাভেদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এটিও ভারতবর্ষের এক ভিন্ন ছবি। ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত সভ্যতার বাইরের এ ছবি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই ভারতের জনজীবনের মূল ধারাটির মধ্যেকার বিরোধকে

বুঝতে সাহায্য করে। ব্রাহ্মণের সভ্যতা, নাপিতের সভ্যতা, মুসলমানের সভ্যতার আড়ালে যে সমাজগত অনৈক্য তার একেবারে মূলে পৌঁছেছেন লেখক। বিস্ময়করভাবে একই সঙ্গে নাপিত ও মুসলমান — দুই সমাজের একটা স্বাভাবিক চেতনাগত ঐক্যও প্রকাশ করেছেন। এই মিলনের কথার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি ভাবনার মূলগত ঐক্যের রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। উল্লিখিত উদ্ধৃতিটির মধ্যে সামাজিক ন্যায়বোধের প্রশ্নটির সঙ্গে বিজড়িত হয়েছে ভারতীয় জীবনধারার দ্বান্দ্বিক রূপটি। গোরা যে ভারতবর্ষ আবিষ্কার করতে চেয়েছে তার আদর্শগত রূপটিকে ঘিরে যে এক অচল সামাজিক বিভেদের কাঠামো রয়েছে, তাকে একেবারে কাছ থেকে দেখল সে। চর ঘোষপুরে গোরার প্রতিবাদী ভূমিকার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সামনে নিয়ে এলেন এই আদর্শগত দ্বন্দ্বের প্রশ্নটি। গোরার সমগ্র চরিত্রটির মধ্যে, তার সমগ্র অস্তিত্ব চেতনার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল থেকেছে। বাইরে থেকে এই দ্বন্দ্বের মধ্যে কতকগুলি মতবাদ ও সংঘর্ষের রূপ প্রকাশ পেলেও প্রকৃতপক্ষে তা ভারতীয় সমাজ কাঠামোর দিকগুলিকে ঘিরেই আবর্তিত। জেল থেকে বেরোনোর পর আবার যখন গোরা পল্লীভ্রমণে বের হল তখনও পল্লীজীবনের সূত্র ধরে কতকগুলি ছবি তার কাছে স্পষ্টতর হতে লাগল। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করছি ঃ

ক) 'সে দেখিল এই সকল পল্লীতে সমাজের বন্ধন শিক্ষিত ভদ্রসমাজের চেয়ে অনেক বেশি। প্রত্যেক ঘরের খাওয়াদাওয়া শোওয়া বসা কাজকর্ম সমস্তই সমাজের নিমেষবিহীন চোখের উপরে দিনরাত্রি রহিয়াছে। প্রত্যেক লোকেরই লোকাচারের প্রতি অত্যন্ত একটি সহজ বিশ্বাস, সে সম্বন্ধে তাহাদের কোনো তর্কমাত্র নাই। কিন্তু সমাজের বন্ধনে, আচারের নিষ্ঠায় ইহাদিগকে কর্মক্ষেত্রে কিছুমাত্র বল দিতেছে না। ইহাদের মতো এমন ভীত অসহায় আত্মহিতবিচারে অক্ষম জীব জগতে কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। আচারকে পালন করিয়া চলা ছাড়া আর কোনো মঙ্গলকে ইহারা সম্পূর্ণ মনের সঙ্গে চেনেন না, বুঝাইলেও বুঝে না। দণ্ডের দ্বারা, দলাদলির দ্বারা নিষেধটাকেই তাহারা সবচেয়ে বড়ো করিয়া বুঝিয়াছে। কী করিতে নাই এই কথাটাই পদে পদে নানা শাসনের দ্বারা তাহাদের প্রকৃতিকে যেন আপাদমস্তক জালে বাঁধিয়াছে। কিন্তু এ জাল ঋণের জাল, এ বাঁধন মহাজনের বাঁধন, রাজার বাঁধন নহে। ইহার মধ্যে এমন কোনো বড়ো ঐক্য নাই যাহা সকলকে বিপদে সম্পদে পাশাপাশি দাঁড় করাইতে পারে।'[১৩]

খ) '...পল্লীর মধ্যে যেখানে বাহিরের শক্তিসংঘাত তেমন করিয়া কাজ করিতেছে না, সেখানকার নিশ্চেষ্টতার মধ্যে গোরা স্বদেশের গভীরতর দুর্বলতার যে মূর্তি তাহাই একেবারে অনাবৃত দেখিতে পাইল। যে ধর্ম সেবারূপে প্রেমরূপে করুণারূপে আত্মত্যাগ-রূপে এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধারূপে সকলকে শক্তি দেয়, প্রাণ দেয়, কল্যাণ দেয়, কোথাও তাহাকে দেখা যায় না — যে আচার কেবল রেখা টানে, ভাগ করে, পীড়া দেয়, যাহা বুদ্ধিকেও কোথাও আমল দিতে চায় না, যাহা প্রীতিকেও দূরে খেদাইয়া রাখে, তাহাই সকলকে চলিতে-ফিরিতে উঠিতে-বসিতে সকল বিষয়েই কেবল বাধা দিতে থাকে...'[১৪]

গ) 'গোরা প্রথমেই দেখিল গ্রামের নীচজাতির মধ্যে স্ত্রী সংখ্যার অল্পতা-বশত অথবা অন্য যে - কারণ-বশত হউক, অনেক পণ দিয়া তবে বিবাহের জন্য মেয়ে পাওয়া যায়। অনেক পুরুষকে চিরজীবন এবং অনেককে অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকিতে হয়। এদিকে বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে কঠিন নিষেধ। ইহাতে ঘরে ঘরে সমাজের স্বাস্থ্য দূষিত হইয়া উঠিতেছে এবং ইহার অনিষ্ট ও অসুবিধা সমাজের প্রত্যেক লোকই অনুভব করিতেছে, এই অকল্যাণ চিরদিন বহন করিয়া চলিতে সকলেই বাধ্য, কিন্তু ইহার প্রতিকার করিবার উপায় কোথাও কাহারো হাতে নাই।'[১৫]

এমন নানা অত্যন্ত বাস্তব পল্লীচিত্র এবং অসহায় কেবল আচারনিষ্ঠ মানুষের কথা গোরার মনে ভারতবর্ষের গ্রামের ছবিটা স্পষ্ট করেছে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রামবাসী-শহরবাসীর পার্থক্য যে কীভাবে স্বদেশকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে সে ছবিও গোরা দেখেছে। স্বদেশের প্রতি স্বদেশবাসীর রয়েছে বিমুখতা, মমত্বহীনতা। তাই শ্রদ্ধাবোধ ফিরিয়ে নিয়ে আসার কাজটিকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিল গোরা, তার দেশভাবনার মূলটিও ছিল এই কাজের মধ্যে নিহিত। গোরার এই দেশ ভাবনার মধ্যে সবেচেয়ে বেশিভাবে প্রবল হয়ে উঠেছিল নিজের সত্তাকে চেনার প্রয়াস, এই গ্রামে গ্রামে ঘোরা, তথাকথিত নীচ জাতিসমূহের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে তাদের চোখ দিয়ে তাদের সমস্যাকে বোঝার প্রয়াসটি এই আত্মানুসন্ধানেরই চেষ্টা। পল্লীবাংলাকে নিয়ে লেখক রবীন্দ্রনাথ এমনভাবেই ভেবেছিলেন, বাংলা গ্রাম হয়ে উঠেছিল সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিরূপ। পঞ্চভূতের 'পল্লীগ্রামে' নামক রচনায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে, এই দেশের চাষাভূষার দল দেশ কাকে বলে জানে না। কিন্তু তারা সরল সাদাসিধে দৃষ্টিতে জীবনের এক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে যা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ অনুভূতিপ্রবণ মন দিয়ে বিশ্লেষণ করে লিখেছেন ঃ

'আমার নানা চিন্তাবিক্ষিপ্ত চিত্তের কাছে এই ছোটো পল্লীটি তানপুরার সরল সুরের মতো একটি নিত্য আদর্শ উপস্থিত করিয়াছে। সে বলিতেছে - আমি মহৎ নহি, বিস্ময়জনক নহি, কিন্তু আমি ছোটোর মধ্যে সম্পূর্ণ, সুতরাং অন্য সমস্ত অভাব সত্ত্বেও আমার যে একটি মাধুর্য আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমি ছোটো বলিয়া তুচ্ছ, কিন্তু সম্পূর্ণ বলিয়া সুন্দর এবং এই সৌন্দর্য তোমাদের জীবনের 'আদর্শ'।[১৬]

রবীন্দ্রনাথ 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

'যাহা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যাহা সকলের চেয়ে পূর্ণ, যাহা চরম সত্য, তাহা সকলকে লইয়া; এবং তাহাই নানা আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া হইয়া উঠিবার দিকে চলিয়াছে।'[১৭]

এই 'হইয়া উঠিবার' প্রক্রিয়াই 'গোরা' উপন্যাসে আমরা দেখলাম। বিচ্ছিন্নতা, বিভেদের প্রক্রিয়ার বাইরে এই হয়ে ওঠার কথা কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন জীবনদেবতা ভাবনায়। ব্যক্তি গোরা নয়, হয়ে উঠছে একটা সমগ্র সংসার, একটা সমাজ আর হয়ে ওঠার দিকে চলেছে একটি দেশ।

।। তিন ।।

একদিকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি গভীর নিষ্ঠা এবং যেই নিষ্ঠার ফলে সবকিছুকে এক বিশেষ ধর্মাদর্শের ভিত্তিতে দেখার আগ্রহ গোরাকে আবিষ্ট করেছিল - আবার প্রতিনিয়তই তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ববোধ এক তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তিতে চিরে চিরে খুঁজে নিতে চাইত সেই আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্কটুকুকে। এই ধর্মাদর্শ গভীরতর স্বদেশ ভাবনার সঙ্গে যখন একাত্ম হয়ে গেল তখন বিশ্লেষণীশক্তি আরও বৃদ্ধি পেল। মানুষের অস্তিত্বের মূল্য তার মনুষ্যত্বের সাধনা গোরার কাছে প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল। এই তাগিদ থেকেই তার তর্ক, এই তাগিদ থেকেই গ্রামে ঘোরা এবং বলা যায় এই তাগিদ থেকেই জাগ্রত হল প্রেমচেতনা।

গোরা উপন্যাসে এই মনুষ্যত্বের সাধনার মূল ক্ষেত্র পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগস্থাপন, জ্ঞানে, কর্মে ও ভাবে অন্তরের মানুষকে খুঁজতে গিয়ে বারবার গোরাকে স্পর্শ করতে হয়েছে মাটি - সে মাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও জন্মান্তরের সম্পর্ক। এক সময় গাছ হয়ে উঠে নবীনা পৃথিবীর বুকে যে আলো সন্ধান করেছিল রবীন্দ্রনাথের সত্তা, গোরাও তার সমগ্র জীবনসাধনায় ওই কবিসত্তারই পরিমার্জিত রূপ হয়ে উঠেছে। সকল সংকীর্ণতার বাইরে মাটিকে আশ্রয় করে মাথা উঁচু করে সে খুঁজতে চাইছে জীবনের প্রকৃত স্বরূপকে। বহুমুখী ধারায় অবগাহন করে এক জীবন যেন এগিয়ে চলেছে অখণ্ড সত্যের দিকে। তার কাছে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক নিবিড় সংহতিতে সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে, জ্বলে উঠছে আলো। বিপুল মানব সংসার সেই আলোতেই স্নাত।

কারাগারের অন্ধকার গোরাকে দিয়েছে সাধনার নিভৃত কক্ষ। ওই বন্ধনশৃঙ্খল গোরার চেতনাকে শুদ্ধ করেছে, সম্প্রসারিত করেছে তার বোধকে। সে নিরুদ্দেশের পথ থেকে এমন নিগূঢ় জগতে প্রবেশ করেছে যেখানে সে শুনেছে উজ্জ্বল আহ্বান, এক আন্তরিক নির্দেশ, ধীরে ধীরে গোরা এক সম্পূর্ণ বিশ্বমানব হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ গোরা চরিত্রের বিভিন্ন দিক আশ্রয় করে পরম-মানবের সঙ্গে জীব-মানবের সামঞ্জস্যবিধানের কথাটিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, উপনিষদের ধারা এবং লোকায়ত বিশ্বাসের ধারা এক গূঢ় সংহতিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের পরিণামে আনন্দময়ীর মধ্যে ভারতীয় ধর্ম ও জীবনধারার সবকটি সূত্র সুসংহত হয়েছে। উপন্যাসের শেষাংশে 'মা' শব্দটিকে লেখক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছেন। এই 'মা' হয়ে উঠেছেন একটি মহাসম্বন্ধের নাম। ইনি চিরন্তন ভারতীয় সভ্যতারই প্রতীকস্বরূপা, ইনি শক্তিরূপিনী, প্রেমদায়িনী, আবার একেবারেই স্নেহমায়াময়ী দুর্বল মানবী-মা। ইনিই মাটি, পৃথিবী। এ প্রবন্ধে উদ্ধৃত 'বসুন্ধরা' কবিতায় বহু বরষের চেনা পৃথিবীর সঙ্গে মা-আনন্দময়ীর কোন ভেদ নেই। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র উপন্যাস জুড়ে নানা স্তরের মধ্য দিয়ে এই সনাতনী মাতৃশক্তির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন গোরাকে। মা আনন্দময়ী লেখকের চেনা, জানা, বোঝা মাটি ও মানুষেরই সম্মিলিত এক সত্তা।

গোরা তার অন্তরে যে নিগূঢ় নির্দেশ পেয়েছিল, যে আন্তরিক আহ্বান শুনেছিল তা-ই তাকে নিয়ে এল আনন্দময়ীর পদপ্রান্তে, সে এসে পৌঁছল মাটির কাছাকাছি। গোরা যেদিন আনন্দময়ীর কাছে ভারতবর্ষের সন্ধান পেল সেদিন সে সার্থক হল। গোরার প্রেমও হল সম্পূর্ণ।

সুচরিতার প্রতি গোরার আকর্ষণ অনেকটাই তাকে অস্তিত্বের নানা তাত্ত্বিক প্রশ্নের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছিল। নানা সামাজিক ক্রিয়াশীলতার মধ্যে এই প্রশ্নগুলি গোরাকে বিভিন্ন দিক থেকে ভাবিয়ে তুলত। আবার এই প্রশ্নগুলিই তাকে বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেছিল। এই প্রশ্নই তাকে এনে দিল মা আনন্দময়ীর কাছে। সেখানেই সে প্রেমকে পেল। সুচরিতাকে কেন্দ্র করে গোরার ভাবনাগুলি বা সুচরিতার ব্যক্তিত্বের স্পর্শ গোরার চেতনায় যে আলো ফেলেছিল তা-ই তাকে একটি সার্থক ভূমি প্রদান করেছিল। সেই ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে গোরা এল আনন্দময়ীর কাছে। এবং প্রকৃত আনন্দ ও কল্যাণের সাক্ষাৎ পেল।

।। চার ।।

'গোরা' সম্পূর্ণভাবে একটি মানবিক পৃথিবী রচনার কথাই তুলে ধরেছে পাঠকের সামনে। ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা ধর্মভাবনাকে কেন্দ্র করে, কখনও তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সমস্যাকে বিজড়িত করে উপন্যাসের মধ্যে আলোচনা, ব্যাখ্যা, সমালোচনা ও সত্য উদঘাটনের প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছে। কিন্তু এগুলিকে উপন্যাসের কাঠামোর বাইরের দিক বলে মনে হয়। উপন্যাসটির ভেতরের দিকে রয়েছে একটি সুভ্যতার কথা। সেই সভ্যতার বস্তুগত ও ভাবগত উত্তরণের কথা। আর একারণেই উপন্যাসটিকে অনেকের কাছে মহাকাব্য বলে মনে হয়েছে।

গোরার আচার-আচরণ, তার বিশ্বাস ও আত্মপ্রকাশের ভঙ্গিমায় কখনও কখনও তাকে মূর্তিমান আদর্শের মতো মনে হয়েছে। বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার একমুখীন ধ্যানধারণার

প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোরা চরিত্র বা গোরা উপন্যাসটির মধ্যে রয়েছে সময়ের একটি স্বাধীন প্রকাশ। এই প্রকাশই উপন্যাসটিতে তার সমকালীন পরিমণ্ডল ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে একেবারে আধুনিককালে। গোরা উপন্যাসে ভারতীয় সমাজ বহুবর্ণে বিচ্ছুরিত হয়ে প্রকাশলাভ করেছে। আমাদের সামনে গোরা এঁকে দিয়েছে ভারতবর্ষের দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ছবি। অবরুদ্ধ সমাজ বাস্তবতার কথা গোরা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে। জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা, দারিদ্র্য, কুসংস্কারের দ্বারা আবদ্ধ একদল মানুষ তার চৈতন্যকে আঘাত করেছে নির্মমভাবে। কিন্তু গোরা সেই অবরোধকেই শেষ বলে মনে করেনি। পথে চলতে চলতে অসত্যের পর্দা উন্মোচন করতে করতে পৌঁছে গিয়েছে একেবারে এক মানবিক পৃথিবীতে। আনন্দময়ী কেবল তাই 'ভারতবর্ষ' নয় তিনি 'পৃথিবী', পরম মানবিক পৃথিবী - এক নিরবচ্ছিন্ন স্রোত, এক পবিত্র ধারা যা প্রতিমুহূর্তে ছুঁয়ে চলেছে সমকালকে ও অতীতকে এবং ব্যঞ্জনাময় করে তুলছে ভবিষ্যৎকেও।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজাগতিক মানবতার কথা বলেছেন। এই বিশ্বজাগতিকতার মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথ এক বিশ্বায়নের কথা বলেছেন। প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি জাতির স্বাধীন বিকাশ ও প্রকাশের অধিকারের মধ্যেই এক বিশ্বমানবিকতার সার্থক রূপ প্রকাশ পায়। কঠিন থেকে কঠিনতর পথ অতিক্রম করে মানুষ এগিয়ে চলেছে এক শুদ্ধচৈতন্যের দিকে। প্রতিনিয়তই সে আলোর সন্ধান করে ফিরছে। গোরাও এক চূড়ান্ত অতৃপ্তির মধ্যে আলোর সন্ধান করেছে, তার এই সন্ধান তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে।

'আজকাল গোরা নিজের হৃদয়ের মধ্যে যে একটি আকাঙ্খা যে একটি পূর্ণতার অভাব অনুভব করিতেছে, কোনোমতেই কোনো কাজ দিয়াই তাহা সে পুরণ করিতে পারিতেছে না। শুধু সে নিজে নহে, তাহার সমস্ত কাজও যেন ঊর্দ্ধের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিতেছে, 'একটা আলো চাই - উজ্জ্বল আলো, সুন্দর আলো।' যেন আর সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত আছে, যেন হীরামাণিক সোনারূপা দুর্মূল্য নয়, যেন লৌহ বজ্র বর্ম চর্ম দুর্লভ নয়, কেবল আশা ও সান্ত্বনায় উদ্ভাসিত স্নিগ্ধসুন্দর অরুণরাগমণ্ডিত আলো কোথায়...।'[১৮]

এই অতৃপ্তির মধ্যে দাঁড়িয়েই গোরা বিকল্পের সন্ধান করতে পেরেছিল। ওই আলোই শুদ্ধচৈতন্য, ওই আলোই অখণ্ড বিশ্ববোধ। দেশের মাটিতে পা রেখে নিজেকে বিশ্বায়িত করার এই ভাবনা শাশ্বতভাবে আধুনিক চেতনার পরিচয় বহন করে। আলোহীনতার মাঝে ঊর্ধ্বে হাত বাড়িয়ে যে মানুষ কথা বলতে চায়, আকাশের উদারতার মাঝে আপন সত্তাকে উপলব্ধি করতে চায়, সে-ই খুঁজে পায় সত্যকে, আলোকে। রবীন্দ্রনাথের গোরা একথাই বলতে চেয়েছে। গোরা সেই সত্যের বাণী বহন করে চলেছে। চিরদিনই সে চলতে থাকবে, আত্মপ্রকাশ লাভ করবে যুগ থেকে যুগান্তরের মাঝে, জন্ম থেকে জন্মান্তরের ধারাবাহিকতায়। ❑

লেখক একজন তরুণ প্রবন্ধকার

সূত্রনির্দেশ

১) বসুন্ধরা - 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থ/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২) মানুষের ধর্ম - বিশ্বভারতী প্রকাশিত গ্রন্থ/পৃ. ৫১ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩) ছিন্নপত্র/রবীন্দ্রজীবন কোষ/ড. নিমাইচন্দ্র পাল/পুস্তক বিপনি/সোনার তরী
৪) ছিন্নপত্র/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/৫৬
৫) 'এবার ফিরাও মোরে' - চিত্রা কাব্যগ্রন্থ/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬) রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা - অজিতকুমার চক্রবর্তী/মিত্র ও ঘোষ পাব/ পৃ. ৪১
৭) মানুষের ধর্ম/বিশ্বভারতী প্রকাশিত গ্রন্থ /রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/পৃ. ১০-১১
৮) গোরা/বিশ্বভারতী/১৯৭৭/পৃ. ৪৯৬
৯) ঐ
১০) ঐ/পরিশিষ্ট/পৃ. ৫০৩
১১) ঐ/২৬ পরি/প. ১৮৪
১২) ঐ/পৃ. ১৮৮
১৩) ঐ/পৃ. ৪৫৬-৪৫৭
১৪) ঐ/পৃ. ৪৫৮
১৫) ঐ/পৃ. ৪৫৮
১৬) পঞ্চভূত/পল্লীগ্রামে/রবীন্দ্রনাথ/পৃ. ৯০৪/রবীন্দ্ররচনাবলী/সলুভ
১৭) রবীন্দ্রনাথ/পূর্ব ও পশ্চিম/৬ষ্ঠ খণ্ড/সুলভ
১৮) গোরা/বিশ্বভারতী/পৃ. ৪৬৬